সূরা আত তাওবাঃ রুকুঃ ৭ম আয়াত সংখ্যাঃ (৪৩-৫৯)

Sisters'Forum In Islam.com

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَفَا اللّٰهُ عَنۡكَ ۚ لِمَ اَذِنۡتَ لَهُمۡ حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَكَ الَّذِیۡنَ صَدَقُوۡا وَ تَعۡلَمَ الۡكٰذِبِیۡنَ ৯ : ৪৩

৪৩. আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করেছেন কারা সত্যবাদী তা আপনার কাছে স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কারা মিথ্যাবাদী তা না জানা পর্যন্ত আপনি কেন তাদেরকে অব্যাহতি দিলেন?

কোন কোন মুনাফিক বানোয়াট ওযর পেশ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যুদ্ধে যাওয়া থেকে অব্যাহতি চেয়েছিল। তিনিও নিজের স্বভাবগত কোমলতা ও উদারতার ভিত্তিতে তারা যে নিছক ভাওতাবাজী করেছে, তা জানা সত্ত্বেও তাদের অব্যাহতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ এটা পছন্দ করেননি। এ ধরনের উদার নীতি সঙ্গত নয় বলে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছেন। অব্যাহতি দেবার কারণে এ মুনাফিকরা নিজেদের মুনাফিকী ও প্রতারণামূলক কার্যকলাপ গোপন করার সুযোগ পেয়ে গেলো। যদি তাদের অব্যাহতি না দেয়া হতো এবং তারপর তারা ঘরে বসে থাকতো তাহলে তখন তাদের মিথ্যা ঈমানের দাবী সর্বসম্মুখে প্রকাশ হয়ে পড়তো।

এখানে নবী (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে যে, জিহাদে শরীক না হওয়ার অনুমতি প্রার্থীদেরকে তাদের ওজর সত্য ছিল কি না, তা তদন্ত করে না দেখে কেন অনুমতি দিয়ে দিলে? কিন্তু এই তিরস্কারেও স্নেহের প্রভাব বেশী ছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে এতটাই ভালোবাসেন যে, কোনো ত্রুটি ধরার আগেই প্রথমে বলেছেন, "আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করেছেন"। এটি মূলত কোনো শাস্তিমূলক কথা নয়, বরং একটি স্নেহপূর্ণ অনুযোগ। এই জন্য উক্ত ত্রুটির ক্ষমার কথা প্রথমেই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। জেনে রাখা দরকার যে, এই তিরস্কার এই জন্য করা হয়েছে যে, অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়ার সাথে কাজ নেওয়া হয়েছে এবং পূর্ণভাবে সত্যতা যাচাই করে দেখার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। নচেৎ তদন্তের পর যার সত্যই ওজর আছে তাকে অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে মহান আল্লাহর তরফ থেকে তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। যেমন তিনি বলেছেন, {فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ} ''অতএব তারা তোমার কাছে তাদের কোন কাজের অনুমতি চাইলে তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দাও। (সূরা নূর ৬২ আয়াত) 'যাকে ইচ্ছা' মানে হল, যার কাছে সত্যিকারে ওজর আছে, তাকে অনুমতি দেওয়ার অধিকার তোমার রয়েছে।

ۛ لَا يَسۡتَاۡذِنُكَ الَّذِيۡنَ يُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَ الۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ اَنۡ يُّجَاهِدُوۡا بِاَمۡوَالِهِمۡ وَ اَنۡفُسِهِمۡ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيۡمٌۢ بِالۡمُتَّقِيۡنَ ৯ : ৪৪

৪৪. যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদে যেতে আপনার কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করে না। আর আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত।

এ থেকে জানা যায়, ইসলাম ও কুফরীর দ্বন্দ্ব একটি মাপকাঠি স্বরূপ। এর মাধ্যমে খাঁটি মুমিন ও নকল ঈমানের দাবীদারের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। এ দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে যে ব্যক্তি মনপ্রাণ দিয়ে ইসলামকে সমর্থন করে এবং নিজের সমস্ত শক্তি সামর্থ্য ও উপায় উপকরণ তাকে বিজয়ী করার সংগ্রামে নিয়োজিত করে এবং এ পথে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকারে কুণ্ঠিত হয় না, সেই সাচ্চা মুমিন। পক্ষান্তরে এ দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে যে ব্যক্তি ইসলামের সাথে সহযোগিতা করতে ইতস্তত করে এবং কুফরের শির উঁচু হবার বিপদ সামনে দেখেও ইসলামের বিজয়ের জন্য জান-মালের কুরবানী করতে কুণ্ঠিত হয়, তার এ মনোভাব ও কার্যকলাপ এ সত্যটিকে সুস্পষ্ট করে দেয় যে, তার অন্তরে ঈমান নেই।

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ

তারাই তো মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি এবং তাদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারাই সত্যনিষ্ঠ। সূরা হুজুরাতঃ ১৫

প্রকৃত মুমিনের পরিচয় ও সর্বোত্তম আমল:রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, "কোন আমলটি সবচেয়ে উত্তম?" তিনি বললেন:"আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা।" আবার জিজ্ঞেস করা হলো, "তারপর কোনটি?" তিনি বললেন: "আল্লাহর পথে জিহাদ (সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা) করা।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

ইসলামে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস এবং দ্বীনের প্রয়োজনে নিজের জান ও মালের কুরবানি দেওয়ার মানসিকতা—এই দুটি বিষয় একে অপরের পরিপূরক। মুনাফিকরা সবসময়ই ত্যাগের ক্ষেত্রগুলো এড়িয়ে যেতে বাহানা খোঁজে, আর প্রকৃত মুমিনরা সাহসের সাথে এগিয়ে যান।

اِنَّمَا يَسۡتَاۡذِنُكَ الَّذِيۡنَ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَ الۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ وَ ارۡتَابَتۡ قُلُوۡبُهُمۡ فَهُمۡ فِيۡ رَيۡبِهِمۡ يَتَرَدَّدُوۡنَ ৯ : ৪৫

৪৫. আপনার কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করে শুধু তারাই যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে না। আর তাদের অন্তরসমূহ সংশয়গ্রস্ত হয়ে গেছে, সুতরাং তারা আপন সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত।

এখানে সেই মুনাফিক্বদের কথা বর্ণনা হচ্ছে, যারা ছোট্ট ধরনের বাহানা বের করে রসূলের সাথে জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিল। তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ এবং আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে না। আর তার অর্থ এই যে, সেই ঈমানহীনতাই তাদেরদেরকে জিহাদে না যেতে বাধ্য করেছিল। পক্ষান্তরে যদি ঈমান তাদের অন্তরে সুদৃঢ় হত, তাহলে তারা না জিহাদ থেকে গা বাঁচাতো, আর না-ই তাদের মনে কোন প্রকার সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি হতো।

জেনে রাখা দরকার যে, উক্ত জিহাদে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে মুসলিমরা চার দলে বিভক্ত ছিলেন।

প্রথম দল হল তাঁরা, যাঁরা নির্দ্বিধায় প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় দল তাঁরা, যাঁদের প্রথম প্রথম দ্বিধা ছিল এবং তাঁদের মন ভ্রষ্ট ছিল। কিন্তু সত্বর তাঁরা সে দ্বিধাকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

তৃতীয় দল তাঁরা, যাঁদের শারীরিক দুর্বলতা ও অসুস্থতার কারণে অথবা সওয়ারী ও সফরের খরচ না থাকার কারণে সত্যসত্যই ওজর ছিল। যাঁদেরকে স্বয়ং আল্লাহ অনুমতি দান করেছিলেন। (এ ব্যাপারে বর্ণনা **৯১-৯২**নং আয়াতে এসেছে।)

চতুর্থ দল তাঁরা, যাঁরা কেবল অলসতার কারণে শরীক হননি এবং যখন নবী (সাঃ) ফিরে এলেন তখন তাঁরা নিজেদের ত্রুটি ও গোনাহর কথা স্বীকার করে নিজেদেরকে তওবা ও শাস্তির জন্য পেশ করে দিলেন।

এ ছাড়া বাকী লোকেরা মুনাফিক্বদল ও তাদের গুপ্তচর ছিল। এখানে মুসলিমদের প্রথম দল এবং মুনাফিক্বদের কথা উল্লেখ হয়েছে। বাকী তিন দল মুসলিমদের বর্ণনা পরবর্তীতে আসবে।

وَ لَوۡ اَرَادُوا الۡخُرُوۡجَ لَاَعَدُّوۡا لَهٗ عُدَّةً وَّ لٰكِنۡ كَرِهَ اللّٰهُ انۡۢبِعَاثَهُمۡ فَثَبَّطَهُمۡ وَ قِیۡلَ اقۡعُدُوۡا مَعَ الۡقٰعِدِیۡنَ ৯ : ৪৬

৪৬. আর যদি তারা বের হতে চাইত তবে অবশ্যই তারা সে জন্য প্রস্তুতির ব্যবস্থা করত, কিন্তু তাদের অভিযাত্রা আল্লাহ্ অপছন্দ করলেন। কাজেই তিনি তাদেরকে অলসতার মাধ্যমে বিরত রাখেন এবং তাদেরকে বলা হল, যারা বসে আছে তাদের সাথে বসে থাক।

মনের তাগিদ ছাড়া অনিচ্ছায় যুদ্ধযাত্রা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় ছিল না। কারণ তাদের মধ্যে যখন জিহাদে অংশগ্রহণ করার প্রেরণা ও সংকল্প অনুপস্থিত ছিল এবং ইসলামের বিজয়ের জন্য প্রাণপাত করার কোন ইচ্ছাই তাদের ছিল না তখন শুধুমাত্র মুসলমানদের সামনে লজ্জিত হবার ভয়ে অসন্তুষ্ট মনে অথবা কোন অনিষ্ট করার উদ্দেশ্যে তারা জোরেশোরে এগিয়ে আসতো এবং

এটা সমূহ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতো।
যারা মিথ্যা ওজর পেশ করে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি লাভ করেছিল এ কথা সেই মুনাফিক্বদের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে, যদি তারা জিহাদে যাবার ইচ্ছা রাখত, তাহলে অবশ্যই তার জন্য প্রস্তুতি নিত।

فَثَبَّطَهُم শব্দের অর্থ হল, তাদেরকে বিরত রাখলেন। অর্থাৎ, পিছনে থেকে যাওয়া তাদের কাছে পছন্দনীয় বানিয়ে দেওয়া হল। সুতরাং তারা অলস হয়ে গেল এবং মুসলিমদের সাথে বের হল না। (আইসারুত্ তাফাসীর) উদ্দেশ্য হল যে, তাদের বদমায়েশি ও দুরভিসন্ধি সম্পর্কে আল্লাহ অবগত ছিলেন। এই জন্য আল্লাহর তকদীরগত ইচ্ছা এটাই ছিল যে, তারা না যাক।

এটা সেই আল্লাহর ইচ্ছার প্রকাশরূপ আদেশ, যা তকদীরে লেখা ছিল। অথবা অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হয়ে রসূল (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, ঠিক আছে! তোমরা নারী, শিশু, রোগী ও বৃদ্ধদের দলে শামিল হয়ে তাদের মত ঘরে বসে থাক।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন:

হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদতের জন্য নিজেকে মুক্ত করো (মনোযোগ দাও), আমি তোমার অন্তরকে প্রাচুর্য (ধনী) দিয়ে ভরে দেব এবং তোমার দারিদ্র্য দূর করে দেব। আর যদি তা না করো, তবে আমি তোমার হাতকে ব্যস্ততায় ভরে দেব এবং কখনোই তোমার অভাব দূর করব না।" জামে আত-তিরমিযী, হাদীস নম্বর: ২৪৬৬ (অন্য সংস্করণে ২৬৫৪)সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নম্বর: ৪১০৭ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান ও সহীহ বলেছেন

لَوۡ خَرَجُوۡا فِیۡکُمۡ مَّا زَادُوۡکُمۡ اِلَّا خَبَالًا وَّ لَاۡاَوۡضَعُوۡا خِلٰلَکُمۡ یَبۡغُوۡنَکُمُ الۡفِتۡنَۃَ ۚ وَ فِیۡکُمۡ سَمّٰعُوۡنَ لَہُمۡ ؕ وَ اللّٰہُ عَلِیۡمٌۢ بِالظّٰلِمِیۡنَ ৯ : ৪৭

৪৭. যদি তারা তোমাদের সাথে বের হত, তবে তোমাদের ফাসাদই বৃদ্ধি করত এবং ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে ছুটোছুটি করত। আর তোমাদের মধ্যে তাদের জন্য কথা শুনার লোক রয়েছে। আর আল্লাহ যালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত।

এই মুনাফিক্বরা যদি মুসলিম সৈন্যদলে শরীক হত, তাহলে এরা ভুল রায় ও পরামর্শ দিয়ে মুসলিমদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির কারণ হত।

إيضاع শব্দের অর্থ হল নিজ সওয়ারীকে দ্রুতবেগে দৌড়ানো। অর্থাৎ চুগলখোরী প্রভৃতি দ্বারা তোমাদের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টি করায় ছুটাছুটি করত এবং তাতে তারা কোন একটি মিনিটও বরবাদ করত না। আর এখানে 'ফিতনা' থেকে উদ্দেশ্য আপোসের মাঝে বিচ্ছিন্নতা, শত্রুতা ও বিদ্বেষ।

এ থেকে জানা যায় যে, মুনাফিক্বদের গোয়েন্দাগিরী করার জন্য কিছু মানুষ মু' মিনদের সাথেও সৈন্যদলে শামিল ছিল, যারা মুনাফিক্বদের নিকট মুসলিমদের খবর পৌঁছে দিত।

لَقَدِ ابۡتَغَوُا الۡفِتۡنَۃَ مِنۡ قَبۡلُ وَ قَلَّبُوۡا لَکَ الۡاُمُوۡرَ حَتّٰی جَآءَ الۡحَقُّ وَ ظَہَرَ اَمۡرُ اللّٰہِ وَ ہُمۡ کٰرِہُوۡنَ ৯ : ৪৮

৪৮. অবশ্য তারা আগেও ফিতনা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল এবং তারা আপনার বহু কাজে ওলট-পালট করেছিল, অবশেষে সত্যের আগমন ঘটল এবং আল্লাহর হুকুম বিজয়ী হল, অথচ তারা ছিল অপছন্দকারী।

এই আয়াতে মূলত তাবুক যুদ্ধের সময় এবং তার আগের মুনাফিকদের (কপট বিশ্বাসী) ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) যখনই কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতেন বা ইসলাম প্রচারের কাজে এগিয়ে যেতেন, মুনাফিকরা সবসময়ই মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও ফিতনা সৃষ্টির চেষ্টা করত। তারা সত্যের পথকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য নানামুখী চাল চালত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহর পরিকল্পনা ও ইসলামই বিজয়ী হয়, যা মুনাফিকদের তীব্র অপছন্দ ছিল।

তারা চিন্তাশক্তি ও মতামতকে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে খাটিয়েছিল। তারা প্রচেষ্টা চালিয়েছে আপনার দ্বীনকে অপমানিত করতে। যেমন প্রথম যখন আপনি মদীনায় আগমন করেছিলেন তখন আপনার বিরুদ্ধে ইয়াহুদী ও মুনাফিকরা যৌথ প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তারপর যখন বদরের যুদ্ধে মুসলিমরা জয়লাভ করল তখন আব্দুল্লাহ ইবন উবাই ও তার সাথীরা বলল, এ কাজ তো দেখি পথে উঠে এসেছে। তারপর তারা প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর যখনই কোথাও মুসলিমদের বিজয় দেখে তখনই তা তাদেরকে পীড়া দেয়। [ইবন কাসীর]

অর্থাৎ "আল্লাহর আদেশ বিজয় হল, যাতে মুনাফিকরা মর্মপীড়া বোধ করছিল। এর দ্বারা ইঙ্গিত দেয়া হয় যে, জয় বিজয় সবই আল্লাহর আয়ত্তে। যেমন ইতিপূর্বের যুদ্ধসমূহে আপনাকে জয়ী করা হয়েছে, তেমনি এ যুদ্ধেও জয়ী হবেন এবং মুনাফিকদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে পড়বে।

এই মুনাফিক্বরা যখন থেকে তুমি মদীনায় আগমন করেছ তখন থেকেই তোমার বিরুদ্ধে ফিতনা সৃষ্টি করতে এবং তোমার (ক্ষতি সাধনের) জন্য কর্মসমূহ উলট-পালট করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। পরিশেষে বদর যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা তোমাকে বিজয় ও আধিপত্য দান করলেন; যা তাদের জন্য অসহনীয় ও অপছন্দনীয় ছিল। অনুরূপ উহুদ যুদ্ধেও ঐ মুনাফিক্বদল

রাস্তা থেকেই ফিরে এসে সমস্যা সৃষ্টি করার এবং তারপরও প্রত্যেক জায়গাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করেই আসছিল। পরিশেষে মক্কা জয় হল এবং অধিকাংশ আরববাসীরা মুসলমান হয়ে গেল। যার কারণে তারা আক্ষেপ ও আফসোসে হাত মলতে থেকে গেল।

وَ مِنۡهُمۡ مَّنۡ یَّقُوۡلُ ائۡذَنۡ لِّیۡ وَ لَا تَفۡتِنِّیۡ ؕ اَلَا فِی الۡفِتۡنَۃِ سَقَطُوۡا ؕ وَ اِنَّ جَہَنَّمَ ৯ : ৪৯
لَمُحِیۡطَۃٌۢ بِالۡکٰفِرِیۡنَ

৪৯. আর তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে বলে, “আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না। সাবধান! তারাই ফিতনাতে পড়ে আছে। আর জাহান্নাম তো কাফেরদের বেষ্টন করেই আছে।

এ আয়াতে জাদ্দ বিন কায়স নামক জনৈক বিশিষ্ট মুনাফিকের এক বিশেষ বাহানার উল্লেখ করে তার গোমরাহীর বর্ণনা দেয়া হয়। সে জিহাদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যে ওযর পেশ করে বলেছিল আমি এক পৌরুষদীপ্ত যুবক। রোমানদের সাথে যুদ্ধে লড়তে গিয়ে তাদের সুন্দরী যুবতীদের মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। [সা’ দী]

আল্লাহ্ তা’আলা তার কথার উত্তরে বলেনঃ “ভাল করে শোন, এই নির্বোধ এক সম্ভাব্য আশংকার বাহানা করে এক নিশ্চিত আশংকা অর্থাৎ রাসূলের অবাধ্যতা ও জিহাদ পরিত্যাগের অপরাধে এখনই দণ্ডযোগ্য হয়ে গেল। সে যদি মহিলাদের মোহে পড়ার ফিতনা থেকে বাঁচতে এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জিহাদে যাওয়া থেকে বিরত থাকে তবে জেনে নিক যে, সে আরও বড় ফিতনায় পড়েছে। আর সেটা হচ্ছে, দুনিয়াতে শির্ক ও কুফর, আর আখেরাতে তার শাস্তি। [ইবনুল কাইয়্যেম: ইগাসাতুল লাহফান ২/১৫৮-১৫৯]

“আর নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে আছে।” তা থেকে নিস্তার লাভের উপায় নেই। [ইবন কাসীর; সাদী] পরিবেষ্টন করার অর্থ, যারাই আল্লাহর সাথে কুফরী করবে, তার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করবে, জাহান্নামে তাদের ঘিরে রাখবে, কিয়ামতের দিন তাদের সবাইকে একত্রিত করবে। [তাবারী]

‘আমাকে ফিতনায় ফেলো না’ এর একটা অর্থ হল যে, যদি তুমি আমাকে অনুমতি না দাও, তাহলে বিনা অনুমতিতে থেকে গেলে আমার মহাপাপ হবে। এই হিসাবে ফিতনার অর্থে হবে পাপ। অর্থাৎ, ‘আমাকে পাপে ফেলো না।’

ফিতনার দ্বিতীয় অর্থ ধ্বংস। অর্থাৎ, আমাকে সাথে নিয়ে গিয়ে ধ্বংসে পতিত করো না। কথিত আছে যে, জাদ্দ্ বিন কাইস আরয করল যে, ‘(হে মুহাম্মাদ!) তুমি আমাকে সাথে নিয়ে গিয়ে

ফিতনায় ফেলো না। কারণ রোমান মহিলাদেরকে দেখে আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারব না।' তার কথা শুনে নবী (সাঃ) মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং তাকে না যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন। পরক্ষণে এই আয়াত অবতীর্ণ হল। আল্লাহ তাআলা বললেন, ''তারা তো ফিতনায় পড়েই রয়েছে। অর্থাৎ, জিহাদ থেকে দূরে সরে থাকা এবং তা বর্জন করা তো স্বস্থানে একটা বড় ফিতনা ও মহাপাপ; যাতে তারা আলিপ্ত আছে। আর মরণের পর জাহান্নাম তাদেরকে বেষ্টন করবে; যেখান হতে পালিয়ে যাওয়ার কোন পথ পাবে না।

اِنۡ تُصِبۡكَ حَسَنَةٌ تَسُؤۡهُمۡ ۚ وَ اِنۡ تُصِبۡكَ مُصِیۡبَةٌ یَّقُوۡلُوۡا قَدۡ اَخَذۡنَاۤ اَمۡرَنَا مِنۡ قَبۡلُ وَ یَتَوَلَّوۡا وَّ هُمۡ فَرِحُوۡنَ ৯ : ৫০

(৫০) যদি তোমার প্রতি কোন মঙ্গল উপস্থিত হয়, তাহলে তাতে দুঃখিত হয়। আর যদি তোমার উপর কোন বিপদ এসে পড়ে, তখন তারা বলে, 'আমরা তো প্রথম থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম এবং তারা খুশী হয়ে ফিরে যায়।

বাগধারায় এখানে حسنةٌ (মঙ্গল) বলে সাফল্য ও গনীমতের মাল, আর سيئةٌ (বিপদ) বলে অসাফল্য, পরাজয় এবং যুদ্ধে অনুরূপ আশঙ্কনীয় ক্ষতিকে বুঝানো হয়েছে। উক্ত আচরণে সেই অভ্যন্তরীণ অপবিত্রতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, যা মুনাফিক্বদের অন্তরে বিদ্যমান ছিল। যেহেতু অপরের বিপদের সময় আনন্দিত হওয়া এবং মঙ্গল লাভের সময় মনে দুঃখ ও কষ্ট অনুভব করা হল, নিতান্ত শত্রুতার নিদর্শন।মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন—

إِن تَمۡسَسۡكُمۡ حَسَنَةٞ تَسُؤۡهُمۡ وَإِن تُصِبۡكُمۡ سَيِّئَةٞ يَفۡرَحُواْ بِهَاۖ وَإِن تَصۡبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمۡ كَيۡدُهُمۡ شَيۡـًٔاۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعۡمَلُونَ مُحِيط

যদি তোমাদের কোন মঙ্গল হয়, তাহলে তারা নাখোশ হয়, আর তোমাদের অমঙ্গল হলে তারা খোশ হয়। যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং সাবধান হয়ে চল, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা করে, নিশ্চয় তা আল্লাহর জ্ঞানায়ত্তে। আলে ইমরানঃ১২০

যখন তারা মুসলিমদের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব ও ঐক্যবদ্ধতা দেখে এবং শত্রুদের উপর মুসলিমদের বিজয় প্রত্যক্ষ করে, তখন তারা কষ্ট পায়। আর যখন মুসলিমদের মধ্যে দলাদলি ও মতবিরোধ হয়েছে দেখতে পায়, অথবা মুসলিমদের কোন পরাজয় লক্ষ্য করে, তখনি তারা খুশীতে আত্মহারা হয়ে পড়ে। যখনি তাদের এ ধরনের লোকের আবির্ভাব হবে, তখনি আল্লাহ্ তাআলা তাদের গোপন অবস্থা প্রকাশ করে দিবেন। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের এ অবস্থা চলতে থাকবে। [তাবারী]

পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াতে মুনাফিকদের ভয়াবহ অবস্থা এবং তাদের কপট স্বভাব বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাদের বৈশিষ্ট্য হলো যখন মুসলমানরা বিজয় লাভ করে, তখন তারা বলে : আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম। আর যখন কাফিররা প্রাধান্য পায়, তখন তারা বলে : আমরা কি তোমাদের পক্ষে ছিলাম না এবং মুমিনদের হাত থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করিনি? (সুরা নিসা : ১৪১)

আল্লাহ তাআলা কোরআনে তাদের শাস্তি কঠিন শাস্তির মধ্যে একটি হিসেবে উল্লেখ করেছেন : 'নিশ্চয়ই, মুনাফিকরা জাহান্নামের সবচেয়ে নিম্নস্তরে থাকবে, আপনি তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবেন না।' (সুরা নিসা : ১৪৫)

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ৫১ : ৯

(৫১) তুমি বলে দাও, 'আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা ছাড়া অন্য কোন বিপদ আমাদের উপর আসতে পারে না। তিনিই আমাদের কর্মবিধায়ক। আর বিশ্বাসীদের উচিত, কেবল আল্লাহর উপরই ভরসা করা।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমদেরকে মুনাফিকদের কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে আসল সত্যকে সদা সামনে রাখার নির্দেশ দিয়ে বলছেনঃ "বলুনঃ আমাদের বিপদতো অতটুকুই হবে যতটুকু আল্লাহ আমাদের জন্য লিখে রেখেছেন" । অর্থাৎ আমরা যে সকল অবস্থার সম্মুখীন হই, তা আগেই আল্লাহ আমাদের জন্যে নির্ধারিত করে রেখেছেন। তিনিই আমাদের কার্যনির্বাহক ও সাহায্যকারী। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাহ বলেছেন, "প্রতিটি বস্তুরই হাকীকত রয়েছে। কোন বান্দাই প্রকৃত ঈমানের পর্যায়ে পৌছতে পারবে না, যতক্ষণ না এটা দৃঢ়ভাবে জানবে যে, তার যা ঘটেছে তা কখনো তাকে ছেড়ে যেতো না। আর যা তাকে ছেড়ে গেছে তা কখনো তার জন্য ঘটতো না।" [মুসনাদে আহমাদ: ৬/৪৪১-৪৪২] তাই মুসলিমদের আবশ্যক আল্লাহর প্রতি ভালবাসা রাখা এবং পার্থিব উপায় উপকরণকে নিছক মাধ্যম মনে করা। আর মনে করা যে, এগুলোর উপর ভাল মন্দ নির্ভরশীল নয়। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহর হাতে। আমার উপর দায়িত্ব হবে সঠিক কাজটি করে যাওয়া এবং আল্লাহর উপর ভরসা করা। তাঁরই কাছে সার্বিক সহযোগিতা কামনা।

হাদীসে এসেছে, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন, হে বৎস! নিশ্চয় আমি তোমাকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দেব, তুমি আল্লাহকে হিফাযত কর, তিনিও তোমার হিফাযত করবেন, তুমি আল্লাহ্র হিফাযত কর, তুমি তাকে তোমার দিকে পাবে। যখন তুমি কোন কিছু

চাইবে তখন তা চাইবে কেবল আল্লাহর কাছে। আর যখন সাহায্য চাইবে তখন কেবল আল্লাহর সাহায্য চাইবে। আর জেনে রাখ, যদি উম্মতের সবাই তোমার কোন উপকার করতে একত্রিত হয়, তারা তোমার কোন উপকার করতে সমর্থ হবে না, তবে শুধু ঐটুকুই পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি সবাই তোমার কোন ক্ষতি করতে ইচ্ছা করে, তবে শুধু ঐটুকু করতে পারবে যা আল্লাহ তোমার উপর লিখে রেখেছেন। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, আর গ্রন্থটি শুকিয়ে গেছে। [তিরমিযী: ২৫১৬]

এখানে দুনিয়া পূজারী ও আল্লাহ বিশ্বাসী মানসিকতার পার্থক্য সুস্পষ্ট করে তুলে ধারা হয়েছে। দুনিয়া পূজারী নিজের প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য সবকিছু করে। কোন বৈষয়িক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার ওপরই তার প্রবৃত্তির সুখ ও আনন্দ নির্ভর করে। এ উদ্দেশ্য লাভে সক্ষম হলেই সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। আর উদ্দেশ্য লাভে ব্যর্থ হলে সে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। তারপর বস্তুগত কার্যকারণই প্রায় তার সমস্ত সহায় অবলম্বনের কাজ করে। সেগুলো অনুকূল হলে তা মনোবল বেড়ে যেতে থাকে। আর প্রতিকূল হলে সে হিম্মত হারাতে থাকে।

অন্যদিকে আল্লাহতে বিশ্বাসী মানুষ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই সবকিছু করে। এ কাজে সে নিজের শক্তি বা বস্তুগত উপায়-উপকরণের ওপর ভরসা করে না বরং সে পুরোপুরি নির্ভর করে আল্লাহর সত্তার ওপর। সত্যের পথে কাজ করতে গিয়ে সে বিপদ-আপদের সম্মুখীন হলে অথবা সাফল্যের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করলে, উভয় অবস্থায় সে মনে করে আল্লাহর ইচ্ছাই পূর্ণ হচ্ছে। বিপদ আপদ তার মনোবল ভাংতে পারে না। আবার সাফল্যও তাকে অহংকারে লিপ্ত করতে পারে না। কারণ,

প্রথমত সে উভয়কে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বলে মনে করে। সব অবস্থায় সে আল্লাহর সৃষ্ট এ পরীক্ষায় নিরাপদে উত্তীর্ণ হতে চায়।

দ্বিতীয়ত তার সামনে কোন বৈষয়িক উদ্দেশ্য থাকে না এবং তার মাধ্যমে সে নিজের সাফল্য ও ব্যর্থতার বিচার করে না। তার সামনে থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের একটি মাত্র উদ্দেশ্য। বৈষয়িক সাফল্য লাভ করা বা না করার মাধ্যমে তার এ উদ্দেশ্যের নিকটবর্তী হওয়া বা দূরে অবস্থান করার ব্যাপারটি পরিমাপ করা যায় না। বরং আল্লাহর পথে জান ও মাল উৎসর্গ করার যে দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হয়েছিল তা সে কতদূর পালন করেছে। তার ভিত্তিতেই তার পরিমাপ করা যায়। যদি এ দায়িত্ব সে পালন করে থাকে তাহলে দুনিয়ায় সে সম্পূর্ণরূপে হেরে গেলেও তার পূর্ণ আস্থা থাকে যে, সে যে আল্লাহর জন্য ধন-প্রাণ উৎসর্গ করেছে তিনি তার প্রতিদান নষ্ট করে দেবেন না। তারপর বৈষয়িক কার্যকারণ ও উপায়-উপকরণের আশায় সে বসে থাকে না। সেগুলোর অনুকূল ও প্রতিকূল হওয়া তাকে আনন্দিত ও নিরানন্দ করে না। সে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ

আস্থা রাখে। তিনিই কার্যকারণ ও উপায়-উপকরণ রাজ্যের একচ্ছত্র মালিক। কাজেই তার ওপর ভরসা করে সে প্রতিকূল অবস্থায়ও এমন হিম্মত ও দৃঢ় সংকল্প সহকারে কাজ করে যায় যে, দুনিয়া পূজারীরা একমাত্র অনুকূল অবস্থায়ই সেভাবে কাজ করতে পারে। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঐসব দুনিয়া পূজারী মুনাফিকদের বলে দাও, আমাদের ব্যাপারটা তোমাদের থেকে মূলগত ভাবে ভিন্ন। তোমাদের আনন্দ ও নিরানন্দের রীতি-পদ্ধতি আমাদের থেকে আলাদা। তোমাদের নিশ্চিন্ততা ও অস্থিরতার উৎস এক, আমাদের অন্য।

“পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের ওপর এমন কোনো বিপদ আসে না, যা আমি তা সৃষ্টি করার পূর্বেই একটি কিতাবে (লওহে মাহফুজে) লিপিবদ্ধ রাখিনি। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ। এটা এজন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তার জন্য যেন আফসোস না করো এবং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তার জন্য যেন অহংকার না করো”।"সূরা আল-হাদীদ ২২-২৩:

"আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদই আপতিত হয় না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, তিনি তার অন্তরকে হেদায়েত দান করেন। সূরা আত-তাগাবুনঃ ১১

"তোমাদের ওপর যেসব বিপদ-আপদ আসে, তা তোমাদেরই হাতের কামাই (অর্জিত কর্মের ফল)। আর তিনি অনেক গুনাহ তো ক্ষমাই করে দেন।" সূরা আশ-শুরাঃ ৩০

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত:রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চেয়ে উত্তম এবং আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়। তবে উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। তোমার জন্য যা কল্যাণকর, তা অর্জনে সচেষ্ট হও এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও, অলসতা করো না। যদি তোমার কোনো ক্ষতি বা বিপদ হয়, তবে এমনটা বোলো না যে—'আমি যদি এমন করতাম, তবে এমন হতো', বরং বলো—'আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন, তিনি তাই করেছেন' (কাদারুল্লাহি ওয়া মা শা-আ ফায়াল)। কারণ 'যদি' (লাও) শব্দটির ব্যবহার শয়তানের কাজের পথ উন্মুক্ত করে দেয়।" (সহীহ মুসলিমঃ ২৬৬৪)

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত:রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "কোনো বান্দাই ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তাকদীরের ভালো-মন্দের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং এটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করবে যে—তার জীবনে যা ঘটেছে তা কখনোই এড়ানোর ছিল না, আর যা ঘটেনি তা কখনোই ঘটার ছিল না।" (জামে আত-তিরমিযীঃ২১৪৪)

এই আয়াতের শিক্ষা ও তাৎপর্য

তাকদীরের ওপর বিশ্বাস: বান্দার জীবনে যা ঘটে, তা আল্লাহর পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই ঘটে।

ভয় ও দুশ্চিন্তা দূর করা: এই বিশ্বাস মানুষের মনে সাহস জোগায় এবং দুনিয়াবি বিপদ-আপদের অতিরিক্ত ভয় দূর করে।

তাওয়াক্কুল (আল্লাহর ওপর ভরসা): সব পরিস্থিতিতে একমাত্র আল্লাহর ওপর নির্ভর করা এবং তাঁর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকা মুমিনদের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

قُلۡ هَلۡ تَرَبَّصُوۡنَ بِنَاۤ اِلَّاۤ اِحۡدَى الۡحُسۡنَيَيۡنِ ؕ وَ نَحۡنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمۡ اَنۡ يُّصِيۡبَكُمُ اللّٰهُ ৯ : ৫২
بِعَذَابٍ مِّنۡ عِنۡدِهٖۤ اَوۡ بِاَيۡدِيۡنَا ۖ فَتَرَبَّصُوۡۤا اِنَّا مَعَكُمۡ مُّتَرَبِّصُوۡنَ

(৫২) তুমি বলে দাও, 'তোমরা কেবল আমাদের জন্য দু' টি মঙ্গলের মধ্যে একটি মঙ্গলের প্রতীক্ষায় রয়েছ; আর আমরা তোমাদের জন্য এই প্রতীক্ষা করছি যে, আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ হতে অথবা আমাদের হাত দ্বারা কোন শাস্তি প্রদান করবেন। অতএব তোমরা অপেক্ষা করতে থাক, আমরা তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ রইলাম।'

এ আয়াতে মুমিনদের এক বিরল অবস্থার উল্লেখ করে তাদের বিপদে আনন্দ উপভোগকারী কাফেরদের বলা হয় যে, আমাদের যে বিপদ দেখে তোমরা এত উৎফুল্ল, তাকে আমরা বিপদই মনে করিনা বরং তা আমাদের জন্য শান্তি ও সফলতার অন্যতম মাধ্যম। কারণ, মুমিন আপন চেষ্টায় বিফল হলেও স্থায়ী সওয়াব ও প্রতিদান লাভের যোগ্য হয়, আর এটিই সকল সফলতার মূলকথা। তাই তারা অকৃতকার্য হলেও কৃতকার্য। আল্লাহ বলেন, বলুন, তোমরা কি আমাদের দুটি মঙ্গলের একটির প্রতীক্ষায় আছ?। ইবন আব্বাস বলেন, সে দুটি বিষয় হচ্ছে, বিজয় তথা গনীমত অথবা শাহাদাত। আমরা নিহত হলেও শাহাদাতে ধন্য হব, সেটা তো জীবন ও জীবিকার নাম। অথবা আল্লাহ আমাদের হাতে তোমাদেরকে অপমানিত করবেন। [তাবারী; কুরতুবী]

অপরদিকে কাফেরদের অবস্থা হল তার বিপরীত। আযাব থেকে কোন অবস্থায়ই তাদের অব্যাহতি নেই। এ জীবনেই তারা মুসলিমগনের মাধ্যমে আল্লাহর আযাব ভোগ করবে এবং এভাবে তারা দুনিয়া ও আখেরাতের লাঞ্ছনা পোহাবে। আর যদি এ দুনিয়ায় কোন প্রকারে নিস্কৃতি পেয়েও যায়, তবে আখেরাতের আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় নেই; তা অবশ্যই ভোগ করবে। আর দুনিয়ার আযাব, হয়ত সে আযাব হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে ধ্বংসকারী আযাব নাযিল হওয়ার মাধ্যমে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণকে পেয়ে বসেছিল। অথবা তিনি তোমাদের হত্যা করার অনুমোদন দিবেন। সুতরাং তোমরা শয়তানের ওয়াদার অপেক্ষায় থাকো, আমরাও আল্লাহর ওয়াদার অপেক্ষায় থাকলাম। [কুরতুবী]

قُلۡ اَنۡفِقُوۡا طَوۡعًا اَوۡ كَرۡهًا لَّنۡ يُّتَقَبَّلَ مِنۡكُمۡ ؕ اِنَّكُمۡ كُنۡتُمۡ قَوۡمًا فٰسِقِيۡنَ ৯ : ৫৩

(৫৩) তুমি (আরো) বলে দাও, ‘তোমরা সন্তুষ্টির সাথে ব্যয় কর কিংবা অসন্তুষ্টির সাথে, তোমাদের পক্ষ থেকে তা কখনই গৃহীত হবে না; নিঃসন্দেহে তোমরা আদেশ লংঘনকারী সমাজ।’

أَنفِقُوا আদেশসূচক ক্রিয়া। কিন্তু এখানে শর্ত ও জাযার অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, যদি তোমরা ব্যয় কর, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কিম্বা এখানে আদেশ খবরের অর্থে এসেছে। উদ্দেশ্য হল, উভয় কর্মই সমান; ব্যয় কর অথবা না কর। তোমরা সন্তুষ্টির সাথে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলেও তা অগ্রহণযোগ্য। কেননা, তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হল ঈমান। আর সেটাই তোমাদের মাঝে নেই।

(লুবাব গ্রন্থে রয়েছে, ইবনে জারীর (রঃ) তাখরীজ করেছেন যে, জাদ ইবনে কায়েস বলে “আমি দেখি যে, ধৈর্যধারণের শক্তি আমার নেই। তবে হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি আপনাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করবো।” তখন আল্লাহ তা’আলা . আয়াতটি অবতীর্ণ করেন) কেননা তোমরা তো ফাসেক বা আল্লাহর আদেশ লংঘনকারী সমাজ। তোমাদের দান-খয়রাত কবুল না করার কারণ হচ্ছে তোমাদের কুফরী।

পক্ষান্তরে অসন্তুষ্টির সাথে খরচ করা মাল এমনিতেই আল্লাহর কাছে প্রত্যাখ্যাত। কেননা, এখানে সঠিক উদ্দেশ্য বিদ্যমান নেই, যা কবুল হওয়ার জন্য জরুরী। এই আয়াতটি সেইরূপ যেরূপ আল্লাহ পাক বলেন, {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} ‘‘তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর।’ ’ (সুরা তাওবাহ ৮০ আয়াত) অর্থাৎ, উভয়ই সমান।

وَ مَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّاۤ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَ بِرَسُوْلِهٖ وَ لَا يَاْتُوْنَ ৫৪ : ৯
الصَّلٰوةَ اِلَّا وَ هُمْ كُسَالٰى وَ لَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَ هُمْ كٰرِهُوْنَ

(৫৪) আর তাদের দান-খয়রাত গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে, আর তারা নামাযে শৈথিল্যের সাথেই উপস্থিত হয় এবং তারা অনিচ্ছাকৃতভাবেই দান করে থাকে।

কারণ, ঈমান থাকা আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। কাফের যত আমলই করুক না কেন ঈমান না থাকার কারণে সেটা আখেরাতে তার কোন কাজে আসবে না। কাফের যদি কোন ভাল কাজ করে, যেমন আত্মীয়দের দান করে, অসহায়কে সহায়তা দেয়, কাউকে বিপদ থেকে উত্তরণে সহায়তা করে, সে এ সমস্ত ভাল কাজের দ্বারা আখেরাতে উপকৃত হতে পারবে না। তবে দুনিয়াতেই তাকে সেটার কারণে পর্যাপ্ত রিযক দেয়া হবে।

হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইবন জুদ’আন, সে তো জাহেলিয়াতের যুগে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করত, মিসকীনদের খাওয়াত, এগুলো কি তার

কোন উপকার দিবে? তিনি বললেনঃ না, তার কোন উপকার দিবে না। কেননা, সে কোন দিন বলেনি, হে রব! কিয়ামতের দিন আমার অপরাধ ক্ষমা করে দাও। [মুসলিম: ২১৪]

অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ কোন মুমিনের সামান্যতম সৎকাজও নষ্ট হতে দেন না। দুনিয়াতে সেটার বিনিময় দেন আর আখেরাতে তো তার জন্য প্রতিফল রয়েছেই। পক্ষান্তরে কাফের, তাকে তার প্রশংসনীয় কাজগুলোর বিনিময় দুনিয়াতে জীবিকা প্রদান করেন। অবশেষে যখন আখেরাতে পৌছবে, তখন তার এমন কোন কাজ থাকবে না যার প্রতিফল তিনি তাকে দেবেন। [মুসলিম: ২৮০৮]

আয়াতে মুনাফিকদের দুটি আলামত বর্ণিত হয়েছে। সালাতে অলসতা ও দান খয়রাতে কুন্ঠাবোধ। এতে মুসলিমদের প্রতি হুশিয়ার প্রদান করা হয়েছে, যেন তারা মুনাফিকদের এই দুপ্রকার অভ্যাস থেকে দুরে থাকে। বরং তারা যেন সালাতে অত্যন্ত তৎপরতা ও আগ্রহের সাথে হাজির হয়, তাদের মধ্যে বিমর্ষভাব, অনীহা না থাকে। দানের ক্ষেত্রেও তারা যেন মন খুলে খুশী মনে একমাত্র আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশা করে দান করে। কোনক্রমেই মুনাফিকদের মত না হয়। [সা' দী]

فَلَا تُعۡجِبۡكَ اَمۡوَالُهُمۡ وَ لَاۤ اَوۡلَادُهُمۡ ؕ اِنَّمَا یُرِیۡدُ اللّٰهُ لِیُعَذِّبَهُمۡ بِهَا فِی الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا وَ ৯ : ৫৫
تَزۡهَقَ اَنۡفُسُهُمۡ وَ هُمۡ کٰفِرُوۡنَ

(৫৫) অতএব তাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহর ইচ্ছা শুধু এটাই যে, এসব বস্তুর মাধ্যমে তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি প্রদান করবেন এবং তাদের প্রাণ কাফের অবস্থাতে দেহত্যাগ করবে।

কারণ, এ সব তাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। যেমন মহান আল্লাহ আরো বলেন, ''আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য-স্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি তুমি কখনোও তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করো না।(সূরা ত্বাহা ১৩১ আয়াত) ''তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তার দ্বারা তাদের জন্যে সর্বপ্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? বরং তারা বুঝে না। (সূরা মু' মিনূন ৫৫-৫৬ আয়াত)

এ ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্তুতির মায়ার ডোরে আবদ্ধ হয়ে তারা সে মুনাফিকী নীতি অবলম্বন করেছে, সেজন্য মুসলিম সমাজে তারা চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। এতদিনকার আরবীয় সমাজে তাদের যে প্রভাব-প্রতিপত্তি, মান-মর্যাদা, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ছিল নব্য ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় তা সম্পূর্ণ মাটিতে মিশে যাবে। যেসব নগণ্য দাস ও দাস পুত্ররা এবং মামুলী

কৃষক ও রাখালরা ঈমানী নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার প্রমাণ পেশ করেছে, এ নতুন সমাজে তারা হবে মর্যাদাশীল অন্যদিকে বংশানুক্রমিক সমাজনেতা ও সমাজপতিরা নিজেদের দুনিয়া প্রীতির কারণে মর্যাদাহীন হয়ে পড়বে।

ইমাম ইবনে কাসীর এবং ইবনে জারীর ত্বাবারী (রঃ) বলেছেন, এ শাস্তি থেকে যাকাত ও আল্লাহর রাস্তায় দান-খয়রাত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, এই মুনাফিক্বদের নিকট থেকে যাকাত ও স্বাদক্বাহ (যা তারা নিজেদেরকে মুসলমান প্রকাশ করার জন্য দিয়ে থাকে তা) দুনিয়াতে কবুল করে নেওয়া হোক, যাতে এইভাবে তাদেরকে সম্পদের মারও দুনিয়াতে দেওয়া হয়।

পরন্তু তাদের মৃত্যু কুফরী অবস্থায় আসবে। যেহেতু, তারা আল্লাহর পয়গম্বরকে সত্য হৃদয়ে স্বীকার করতে রাজী নয়; বরং তারা তাদের কুফরী ও নিফাকেই দস্তরমত অটল রয়েছে।

হযরত উমরের (রা.) মজলিসে একবার একটি ঘটনা ঘটেছিল। সেটি ছিল এ অবস্থার একটি চমকপ্রদ চিত্র। সুহাইল ইবনে আমর ও হারেস ইবনে হিশামের মতো বড় বড় কুরাইশী সরদাররা হযরত উমরের (রা.) সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন। সেখানে আনসার ও মহাজিরদের মধ্যে থেকে মামুলী পর্যায়ের কোন লোক হলেও হযরত উমর (রা.) তাকে ডেকে নিজের কাছে বসাচ্ছিলেন এবং এ সমাজপতিদের সরে তার জন্য জায়গা করে দিতে বলেছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সমাজপতিরা সরতে সরতে একেবারে মজলিসের কিনারে গিয়ে পৌঁছলেন। বাইরে বের হয়ে এসে হারেস ইবনে হিশাম নিজের সাথীদের বললেন, তোমরা দেখলে তো আজ আমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হলো? সুহাইল ইবনে আমর বললেন, এতে উমরের কোন দোষ নেই। দোষ আমাদের। কারণ আমাদের যখন এ দ্বীনের দিকে ডাকা হয়েছিল তখন আমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম এবং এ লোকেরা দৌড়ে এসেছিল। তারপর এ দু সমাজপতি দ্বিতীয়বার হযরত উমরের কাছে হাযির হলেন। এবার তারা বললেন, আজ আমরা আপনার আচরণ দেখলাম। আমরা জানি, আমাদের ত্রুটির কারণেই এ অবস্থা হয়েছে। কিন্তু এখন এর প্রতিবিধানের কোন উপায় আছে কি? হযরত উমর (রা.) মুখে কোন জবাব দিলেন না। তিনি শুধু রোম সীমান্তের দিকে ইশারা করলেন। মানে, তিনি বলতে চাচ্ছিলেন, এখন জিহাদের ময়দানে জান-মাল উৎসর্গ করো, তাহলে হয়তো তোমরা নিজেদের হারানো মর্যাদা আবার ফিরে পাবে।

এতসব লাঞ্ছনা-গাঞ্জনার মধ্যেও তাদের জন্য আরো বড় বিপদ হবে এই যে, তারা নিজেদের মধ্যে যে মুনাফিকী চরিত্র বৈশিষ্ট্য লালন করছে তার বদৌলতে মরার আগ পর্যন্ত তারা সত্যিকার ঈমান লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং নিজেদের পার্থিব সুখ-সুবিধা ধ্বংস করার পর দুনিয়া থেকে এমন অবস্থায় বিদায় নেবে যে, তাদের আখেরাত হবে এর চাইতেও অনেক বেশী খারাপ।

وَ يَحۡلِفُوۡنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمۡ لَمِنۡكُمۡ ؕ وَ مَا هُمۡ مِّنۡكُمۡ وَ لٰكِنَّهُمۡ قَوۡمٌ یَّفۡرَقُوۡنَ ৯ : ৫৬

(৫৬) আর তারা আল্লাহর কসম করে বলে যে, তারা (মুনাফিকরা) তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তারা হচ্ছে ভীতু সম্প্রদায়।

এই ভীরুতার ফলেই তারা মিথ্যা কসম খেয়ে এটা প্রকাশ করতে চায় যে, আমরাও তোমাদের দলভুক্ত।

لَوۡ یَجِدُوۡنَ مَلۡجَاً اَوۡ مَغٰرٰتٍ اَوۡ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوۡا اِلَیۡهِ وَ هُمۡ یَجۡمَحُوۡنَ ৯ : ৫৭

(৫৭) যদি তারা কোন আশ্রয়স্থল অথবা গিরি-গুহা কিংবা লুকাবার একটু স্থান (তহখানা) পায়, তাহলে তারা অবশ্যই (লাগামহীন ঘোড়ার মত) ক্ষিপ্রগতিতে সেই দিকে পলায়ন করবে।

মদীনার এ মুনাফিকদের বেশীরভাগই ধনী ও বয়স্ক। ইবনে কাসির তার আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া গ্রন্থে তাদের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে শুধুমাত্র একজন যুবকের নাম পাওয়া যায়। তাদের একজনও গরীব নয়। এরা মদীনায় বিপুল-ভূ-সম্পত্তি ও চারদিকে ছড়িয়ে থাকা বিরাট কারবারের মালিক ছিল। সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা এদের সুযোগ-সন্ধানী ও সুবিধাবাদী বানিয়ে দিয়েছিল। ইসলাম যখন মদীনায় পৌঁছলো এবং জনবসতির একটি বড় অংশপূর্ণ আন্তরিকতা ও ঈমানী জোশের সাথে ইসলাম গ্রহণ করলো তখন এ শ্রেণীটি পড়লো উভয় সংকটে। তারা দেখলো এ নতুন দ্বীন একদিকে তাদের নিজেদের গোত্রের অধিকাংশ বরং তাদের ছেলেমেয়েদের পর্যন্ত ঈমানের নেশায় মাতিয়ে তুলেছে। তাদের বিপরীত সারিতে দাঁড়িয়ে তারা যদি এখন কুফরী ও অস্বীকারের ঝাণ্ডা উত্তোলিত করে রাখে, তাহলে তাদের নেতৃত্ব-সরদারী, প্রভাব-প্রতিপত্তি, মান-সম্মান, সুনাম-সুখ্যাতি, সবকিছুই হারিয়ে যাবে। এমনকি তাদের নিজেদের পারিবারিক পরিমণ্ডলেই তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার আশঙ্কা দেখা দেবে।

অন্যদিকে এ দ্বীনের সাথে সহযোগিতা করার অর্থ হবে, তাদেরকে সমগ্র আরবের এমনকি চারপাশের সমস্ত জাতি-গোত্র ও রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকা। সত্য ও ন্যায় যে আসলেই একটি মূল্যবান জিনিস তার প্রেম সুধা পান করে যে মানুষ সব রকমের বিপদ আপদ মাথা পেতে নিতে পারে, এমনকি প্রয়োজনে নিজের জান-মালও পর্যন্ত কুরবানী করতে পারে। পার্থিব স্বার্থে মোহ ও প্রবৃত্তির গোলামীতে আকণ্ঠ ডুবে থাকার কারণে সে কথা উপলব্ধি করার যোগ্যতা তারা হারিয়ে ফেলেছিল। তারা দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়কে শুধুমাত্র স্বার্থ ও সুবিধাবাদের দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তাই ঈমানের দাবী করার মধ্যেই তারা নিজেদের বৈষয়িক স্বার্থ সংরক্ষণের সবচেয়ে অনুকূল ও উপযোগী পথ খুঁজে পেয়েছিল। কারণ তারা এভাবে একদিকে নিজেদের জাতি-সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেদের বাহ্যিক মান-সম্ভ্রম, সহায়-সম্পদ ও

ব্যবসা-বাণিজ্য যথাযথ ভাবে টিকিয়ে রাখতে পারবে। অন্যদিকে মু’ মিন হওয়াটাও তাদের এড়িয়ে যাওয়া দরকার, যাতে আন্তরিকতার পথ অবলম্বন করার ফলে অনিবার্যভাবে যেসব বিপদ আপদ ও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, তার হাত থেকে রেহাই পেতে পারে। তাদের এ মানসিক অবস্থাকে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আসলে তারা তোমাদের সাথে নেই। বরং ক্ষতির ভয় তাদেরকে জবরদস্তি তোমাদের সাথে বেধে দিয়েছে। যে জিনিসটি তাদের নিজেদের কে মুসলমানদের মধ্যে গন্য করাতে বাধ্য করেছে তা হচ্ছে এই ভীতি যে, মদীনায় থাকা অবস্থায় যদি তারা প্রকাশ্যে অমুসলিম হয়ে বাস করতে থাকে তাহলে তাদের সমস্ত মর্যাদা ও প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে এমনকি স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সাথেও তাদের সম্পর্কে ছেদ ঘটবে। আর যদি তারা মদীনা ত্যাগ করে তাহলে নিজেদের সম্পদ-সম্পত্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করতে হবে। আবার কুফরীর প্রতিও তাদের এতটা আন্তরিকতা ছিল না যে, তার জন্য তারা এসব ক্ষতি বরদাশত করতে পারতো। এ উভয় সংকটে পড়ে তারা বাধ্য হয়ে মদীনায় থেকে গিয়েছে। মন না চাইলেও অনিচ্ছা সত্ত্বেও নামায পড়তো এবং যাকাতকে জরিমানা ভেবে হলেও অগত্যা আদায় করতো। নয়তো প্রতিদিন জিহাদ, কোন না কোন ভয়াবহ দুশমনের সাথে পাঞ্জা কষাকষি এবং জান-মাল কুরবানীর যে বিপদ ঘাড়ে চেপে আছে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তারা এত বেশী অস্থির যে, যদি তারা সাধারণ কোন সুড়ঙ্গ তথা কোন গর্তও দেখতে পেতো এবং সেখানে গেলে নিরাপদ আশ্রয় লাভের সম্ভাবনা থাকতো তাহলে দৌড়ে গিয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়তো।

وَ مِنۡهُمۡ مَّنۡ یَّلۡمِزُكَ فِی الصَّدَقٰتِ ۚ فَاِنۡ اُعۡطُوۡا مِنۡهَا رَضُوۡا وَ اِنۡ لَّمۡ یُعۡطَوۡا مِنۡهَاۤ ৫৮ : ৯
اِذَا هُمۡ یَسۡخَطُوۡنَ

(৫৮) আর তাদের মধ্যে এমন কতক লোক রয়েছে যারা স্বাদক্বার (বণ্টন) ব্যাপারে তোমার প্রতি দোষারোপ করে। অতঃপর যদি তারা ঐ সমস্ত স্বাদক্বাহ হতে (অংশ) প্রাপ্ত হয়, তাহলে তারা সন্তুষ্ট হয়, আর যদি তারা তা থেকে (অংশ) না পায়, তাহলে ক্ষুব্ধ হয়।

এ প্রথমবার আরবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী ধন-সম্পদের অধিকারী লোকদের উপর যথারীতি যাকাত ধার্য করা হয়েছিল। তাদের কৃষি উৎপাদন, গবাদিপশু ও ব্যবসায় পণ্য এবং খনিজ দ্রব্য ও সোনা রূপার সঞ্চয় থেকে আড়াই ভাগ, ৫ ভাগ, ১০ ভাগ ও ২০ ভাগ আদায় করা হতো। একটি বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে এসব যাকাতের সম্পদ সংগ্রহ করা হতো এবং একটি কেন্দ্রে জমা করে বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে খরচ করা হতো। এভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নবী (সা.) এর কাছে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ সংগৃহীত হয়ে আসতো এবং তার হাত দিয়ে তা লোকদের মধ্যে বিতরণ করা হতো, যা ইতিপূর্বে আরবের লোকেরা কখনো এক জন লোকের

হাতে একই সঙ্গে সংগৃহীত হতে এবং তার হাত দিয়ে খরচ হতে দেখেনি। এ সম্পদ দেখে দুনিয়া পূজারী মুনাফিকদের জিভ দিয়ে লালা ঝরতো।

আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পদ বন্টন করছিলেন, তখন যুল খুওয়াইসরা আত-তামীমী এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ইনসাফ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, দুর্ভোগ তোমার, কে ইনসাফ করবে যদি আমি ইনসাফ না করি? উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমাকে ছাড়ুন, আমি তাঁর গর্দান উড়িয়ে দেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে ছেড়ে দাও; তার কিছু সঙ্গী-সাথী রয়েছে যাদের সালাতের কাছে তোমরা তোমাদের সালাতকে, তাদের সাওমের কাছে তোমাদের সাওমকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর তূণীর থেকে বেরিয়ে যায়। ... আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বলেছেন এবং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। [বুখারী: ৬৯৩৩]

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কথাই বর্ণনা করছেন যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বন্টনের উপর আপত্তি উত্থাপন করত। তাদের এ আপত্তি বা সমালোচনা কোন সঠিক উদ্দেশ্য বা গ্রহণযোগ্য মতের উপর ভিত্তি করে ছিল না। বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল কিছু পাওয়া। কিছু দেওয়া হলে তারা সন্তুষ্ট হয়, আর কিছু না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। এ অবস্থা বান্দার জন্য কাম্য হতে পারে না যে, তার সন্তুষ্টি ও ক্রোধ নির্ভর করবে তার দুনিয়ার চাহিদা বা খারাপ উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার উপর, বরং প্রত্যেকের উচিত তার চাহিদা হবে তার রবের সন্তুষ্টি অনুযায়ী। [সা'দী]

وَ لَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ ۙ وَ قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ ৫৯ : ৯
فَضْلِهٖ وَ رَسُوْلُهٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ

(৫৯) আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাদেরকে যা কিছু দান করেছিলেন যদি তারা তা নিয়ে সন্তুষ্ট হত, আর বলত, 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, ভবিষ্যতে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহ হতে আমাদেরকে আরো দান করবেন এবং তাঁর রসূলও, আমরা আল্লাহরই প্রতি আগ্রহান্বিত রইলাম।' (তাহলে তা তাদের জন্য উত্তম হত।)

গণিমতের মাল থেকে যা কিছু নবী (সা.) তাদের দেন, তাই নিয়ে তারা সন্তুষ্ট থাকতো। অন্যদিকে আল্লাহর অনুগ্রহে তারা যা কিছু উপার্জন করে এবং অর্থ উপার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উপকরণের

মাধ্যমে যে ধরনের সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধির তারা লাভ করছে তাকেই নিজেদের জন্য যথেষ্ট মনে করতো।

যাকাত ছাড়াও অন্য যে সমস্ত ধন-সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে আসবে তা থেকে নিজ নিজ প্রাপ্য অনুযায়ী আমরা অংশ লাভ করতে থাকবো, যেমন ইতিপূর্বে করে এসেছি।

দুনিয়া ও তার তুচ্ছ সম্পদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নেই। বরং আমাদের দৃষ্টি রয়েছে আল্লাহ ও তাঁর অনুগ্রহের ওপর। তাঁরই সন্তুষ্টি আমরা চাই। আমাদের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে। তিনি যা দেন তাতেই আমরা সন্তুষ্ট।

সুতরাং মহান আল্লাহ এখানে এই শিক্ষা দিলেন যে, তিনি যা কিছু দান করবেন তার উপর মানুষের সবর করা উচিত। সকল কাজে তাঁরই উপর ভরসা করতে হবে এবং তাঁকেই যথেষ্ট মনে করতে হবে। আগ্রহ, মনোযোগ, লোভ, আশা ইত্যাদির সম্পর্ক তাঁর সাথেই রাখা উচিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আনুগত্যের ব্যাপারে চুল পরিমাণও যেন ত্রুটি না হয়। আর আল্লাহ তা'আলার কাছে এই তাওফীক চাইতে হবে যে, তিনি যেন তাঁর হুকুম পালনের, নিষিদ্ধ কাজ বর্জনের, ভাল কথা মেনে নেয়ার এবং সঠিক আনুগত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করেন!